পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ৯ মাঘ ১৪২১, ২২ জানুয়ারি ২০১৫

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

পররাষ্ট্র মন্ত্রী,

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম।

আপনাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন তৎকালীন পাকিস্তান ফরেন সার্ভিসের অনেক বাঙালি কর্মকর্তা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। পাশাপাশি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনসহ বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত প্রবাসীরাও স্বাধীনতার পক্ষে কাজ শুরু করেন। এই মিলিত কর্মতৎপরতার ফলেই বহির্বিশ্বে স্বাধীন বাংলাদেশের পক্ষে দ্রুত জনসমর্থন গড়ে উঠে।

স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একদল তরুণ কূটনীতিকদের নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা ছিল- ''সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়''।

বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব এবং আমাদের কূটনীতিবিদদের নিরলস পরিশ্রমের ফলে স্বাধীনতার অল্পদিনের মধ্যেই কয়েকটি দেশ ছাড়া বাংলাদেশ বিশ্বের প্রায় সকল দেশের স্বীকৃতি আদায় করতে পেরেছিল। যার চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভের মধ্য দিয়ে।

১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বাংলায় ভাষণ দেন। তাঁর ভাষণে বঙ্গবন্ধু দৃঢ়চিত্তে ঘোষণা করেনঃ ''বাংলাদেশের সংগ্রাম ন্যায় ও শান্তির জন্য সার্বজনীন সংগ্রামের প্রতীকস্বরূপ। সুতরাং, বাংলাদেশ শুরু থেকে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পাশে দাঁড়াবে এটাই স্বাভাবিক।''

তিনি আরও বলেন, ''মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার। এই শান্তির মধ্যে সারাবিশ্বের সকল নর-নারীর গভীর আশা-আকাঙ্খা মূর্ত হয়ে ওঠে। ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে শান্তি কখনও স্থায়ী হতে পারে না।''

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সাফল্যের অগ্রযাত্রা থেমে যায়।

অবৈধ ক্ষমতাদখলকারীরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পেশাদারিত্বকে অবজ্ঞা করে। জাতির পিতার হত্যাকারী ও জাতীয় চার নেতার খুনীদের বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক পদে নিয়োগ দিয়ে এই মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি সারাবিশ্বের কাছে কলঙ্কিত করে। মেধা বা যোগ্যতা নয়, দলের প্রতি অন্ধ আনুগত্যই হয়ে দাঁড়ায় সকল পদোন্নতি ও পোস্টিং এর একমাত্র মাপকাঠি।

দীর্ঘ একুশ পর আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে আবার সরকার গঠনের পর আমাদের কূটনীতি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের দিকে এগিয়ে যায়। আমাদের পররাষ্ট্রনীতি হয়ে ওঠে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার অন্যতম হাতিয়ার।

এ সময় আমরা ভারতের সাথে ঐতিহাসিক গঙ্গা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি সম্পাদন করি। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির মধ্য দিয়ে পাহাড়ে দীর্ঘদিনের সংঘাত ও অশান্তির অবসান ঘটাই।

ভারত ও পাকিস্তান পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার পর পরই আমি এ দুই দেশে শান্তির বার্তা নিয়ে ছুটে যাই।

২০০০ সালে জাতিসংঘ সহস্রাব্দ সম্মেলনে আমি সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার প্রতি বাংলাদেশের সর্বাত্মক অঙ্গীকার ঘোষণা করি। এসময় আন্তর্জাতিক শান্তি ও উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য আমাকে সেরেস পদক, ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার, মাদার তেরেসা পদকসহ বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তার আর্থ-সামজিক অগ্রগতির জন্য প্রশংসিত হয়।

২০০১ সালের প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে এক কালো অধ্যায়ের সূচনা করে।

নির্বাচনের পরপরই সারাদেশে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী-সমর্থক-ভোটার এবং সংখ্যালঘুদের নির্বিচারে হত্যা, গণধর্ষণ, ভিটাবাড়ী লুট, অগ্নিসংযোগ বিশ্বে বাংলাদেশকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করে। ফলে বাংলাদেশ পরিচিতি পায় পাঁচবার দুর্নীতির বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এবং একই সময়ে ৫০০ জায়গায় বোমা হামলার দেশ হিসেবে। সাংবাদিক নির্যাতনের দেশ হিসেবেও পরিচিতি পায় বাংলাদেশ।

একজন কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীকে ওআইসি'র মহাসচিব পদে প্রার্থী দিয়ে তৎকালীন বিএনপি-জামাত সরকার দেশের জন্য বয়ে আনে লজ্জা ও অপমান।

প্রতিবেশী দেশগুলোসহ উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নেমে আসে স্থবিরতা।

২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ আমাদের পররাষ্ট্রনীতির জন্য ছিল কঠিন চ্যালেঞ্জ। আমরা সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সফল হয়েছি।

আমরা ঘোষণা করি, বাংলাদেশে কোনভাবেই সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। আমাদের ভূখন্ড ব্যবহার করে প্রতিবেশী দেশগুলোর স্বার্থ পরিপন্থী কোন কাজ আমরা হতে দেব না। একই সাথে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও শ্রদ্ধাবোধের ভিত্তিতে আমাদের ন্যায্য হিস্যা আদায়ে আমরা পিছপা হব না।

পারস্পরিক বন্ধুত্বও রক্ষার পাশাপাশি আমরা মিয়ানমার ও ভারতের সাথে চার দশকের সমুদ্রসীমা বিরোধ আইনি প্রক্রিয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করেছি। এর মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে ১ লাখ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার এলাকায় আমাদের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একইভাবে আমরা ভারতের সাথে স্থল সীমান্ত চুক্তি ও তিস্তা নদীর পানি বণ্টন চুক্তি দুটিকে প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছি। আশা করছি খুব শিগগিরই চুক্তি দু'টি স্বাক্ষরিত হবে।

আমরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করি। চীন, জাপান, মধ্যপ্রাচ্য, রাশিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ উন্নত ও উদীয়মান দেশগুলোর সাথে পারস্পরিক আস্থা ও সহাযোগিতার সম্পর্ক সুসংহত করি।

আমার প্রস্তাবিত বিশ্ব শান্তির মডেল "জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন" জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ সংখ্যক সৈন্য ও পুলিশ সদস্য প্রেরণের গৌরব অর্জন করে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর স্বার্থ সংরক্ষণে আমরা প্রথম সারির নেতৃত্বের ভূমিকা নেই।

বিশ্বমন্দা সত্বেও আমরা ধারাবাহিকভাবে ৬.২ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছি। প্রতি বছর শতকরা ২.৫ হারে দারিদ্র্য হ্রাস করতে পেরেছি। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। এমডিজি অর্জনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছি। বাংলাদেশ উন্নয়নের এক বিস্ময় বা 'মিরাকল' হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পরিচিতি পেয়েছে।

আমাকে ইন্দিরা গান্ধী শান্তি পুরস্কার, এমডিজি অ্যাওয়ার্ড, সাউথ-সাউথ অ্যাওয়ার্ড, ইউনেস্কোর কালচারাল ডাইভারসিটি পদক প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ব সম্প্রদায় বাংলাদেশকেই সম্মানিত করেছে।

আমরা সিপিএ ও আইপিইউ-এর মত আন্তর্জাতিক দুটি শীর্ষ পর্যায়ের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ভোটে নির্বাচিত হই। একইসাথে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাউন্সিল, ইন্টারন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন ইউনিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল মোবাইল স্যাটেলাইট অর্গানাইজেশন-এর মহাপরিচালকের পদসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নির্বাচনে অভাবনীয় সাফল্য লাভ করি।

এর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক মানবতা ও অপরাধ বিষয়ক আইনের সুরক্ষায় আমাদের পূর্ণ অঙ্গীকার ব্যক্ত করি।

মিয়ানমারে ৩য় বিমসটেক শীর্ষ সম্মেলন এবং কাঠমান্ডুতে ১৮তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়ে আমি বহুমুখী আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রতি আমার সরকারের পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করি।

লন্ডনে অনুষ্ঠিত প্রথম গার্ল সামিট-এ একমাত্র আমন্ত্রিত সরকার প্রধান হিসেবে যোগ দেই। ইতালির মিলানে ASEM শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিয়ে আমি ইউরোপীয় দেশগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করি।

মধ্যপ্রাচ্যের ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম দেশগুলোর সাথে আমাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে। এর সুফল পাচ্ছেন সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, আরব আমিরাত সহ মধ্যপ্রাচ্যে প্রবাসী বাংলাদেশিরা। আমার আরব আমিরাত সফরের মধ্য দিয়ে সেদেশের সাথে এবং সার্বিকভাবে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

গত বছর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনকালে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও জাপানের প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সাথে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা সম্পর্কিত শীর্ষ পর্যায়ের বৈঠকে যৌথ সভাপতিত্ব করি।

আমাদের সরকারের এবারের মেয়াদে আন্তর্জাতিক কূটনীতির অঙ্গনে আমরা একটি শুভ সূচনা উপহার দিতে পেরেছি। আমাদের অর্জনের খাতায় যোগ হয়েছে জাতিসংঘের ভিশনারি অ্যাওয়ার্ড, ইউনেস্কোর 'ট্রি অফ পিস', বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড-এর মত সম্মানজনক সব পুরস্কার।

দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশই বিদেশী বিনিয়োগের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। সামষ্টিক অর্থনীতির সূচকে বাংলাদেশেই এ অঞ্চলের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশ।

বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের উদীয়মান অর্থনীতিকে আরও সম্পৃক্ত করার জন্য আমাদের সব ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে। বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, বিদেশে আমাদের শ্রমবাজারের প্রসার এবং উন্নয়ন সহযোগিতা বাড়াতে কূটনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, মানবপাচার, মাদকপাচার ও চোরাচালানের মত আন্তঃরাষ্ট্রীয় অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রকে আরও বিস্তৃত করতে হবে।

একই সাথে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশকে বিদেশী বিনিয়োগকারী, পর্যটক, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য আকর্ষণীয় গন্তব্যে পরিণত করতে হবে।

প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,

আমাদের সম্মিলিত অর্জনগুলোকে বাধাগ্রস্ত করতে একটি বিশেষ মহল মরিয়া হয়ে উঠেছে। যারা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের বিরেধিতা করেছিল, তারা এদেশকে আবারও সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও সহিংসতার অভয়ারণ্যে পরিণত করতে চায়। বিশ্বের কাছে দেশকে হেয় করতে চায়।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারকে ব্যাহত করতে এরা সারাদেশে নাশকতা, বোমা হামলা, পেট্রোল বোমা দিয়ে পুড়িয়ে ঘুমন্ত মানুষ হত্যা, স্কুল ছাত্র হত্যার মত জঘণ্য অপরাধ করেছিল।

বায়তুল মোকাররমের সামনে শত শত কোরআন শরীফে আগুন দিয়েছিল। মসজিদ-মন্দিরে হামলা করেছিল। শত শত গাড়িতে আগুন দেওয়া, রেললাইনের ফিশপ্লেট তুলে মানুষ হত্যার মত রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করেছিল। ৫ জানুয়ারির নির্বাচন বানচাল করতে ৫৮২টি স্কুলে হামলা ও অগ্নি সংযোগ করেছিল।

নির্বাচনে অংশ না নেওয়াটা ছিল তাদের রাজনৈতিক ভুল। বিএনপি-জামাত অপশক্তি তাদের রাজনৈতিক ভুলের দায়ভার সাধারণ মানুষের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিয়েছে। এই হত্যা ও নাশকতার দায় বিএনপি নেত্রীকেই নিতে হবে।

এদের সন্ত্রাসের কারণে বিশ্ব ইজতেমায় আগত লাখ লাখ মুসুল্লিকে ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে। বিদেশীদের স্বাক্ষর জালিয়াতি, মিথ্যা টেলিফোন আলাপের খবর প্রচার করে এরা বিশ্বের সামনে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে।

দেশবিরোধী এসব অপকর্মের বিরুদ্ধে, বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি সমুন্নত রাখতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের আরও উদ্যোগী ও গতিশীল হতে হবে।

দেশের মানুষের প্রতি আন্তরিক সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করে যেতে হবে। প্রবাসী ভাই-বোনদের স্বার্থ সুরক্ষায় আরও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে। তাঁরা যাতে কোনভাবেই হয়রানির শিকার না হন, সে ব্যাপারে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

বিদেশে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতেরা দেশের প্রতিনিধি। দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা কর্মচারি রাষ্ট্রদূতের নেতৃত্বে সমন্বিতভাবে দেশের স্বার্থে ও জনগণের কল্যাণে কাজ করবেন। কূটনৈতিক শিষ্টাচার বজায় রাখবেন এবং নিজেদের সব ধরণের বিতর্কের উর্ধ্বে রাখবেন।

আপনাদের পেশাগত উৎকর্ষ সাধনের জন্য প্রশিক্ষণ সুবিধাসহ সব ধরণের সহযোগিতা দিতে আমরা কার্পণ্য করব না।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আমাদের লক্ষ্য, ২০২১ সালে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশে পরিণত করা। আমরা চাই, আপনারা বিশ্বে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

বাংলাদেশকে 'প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড' হিসেবে গড়ে তোলার যে স্বপ্ন জাতির পিতা দেখেছিলেন, সেই স্বপ্ন পূরণে আসুন সবাই আমরা একসাথে কাজ করি।

আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...